জৈনধর্ম

An Introduction to Jainism

মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

ঐতিহ্য

আমার মা তাহমিনা হাবীবকে
যিনি আমার সব কাজের প্রধান উৎসাহদাত্রী

ভূমিকা

‘জৈনধর্ম’ (An Introduction to Jainism) একটি ছোট বই। কিন্তু বাংলাদেশে জৈনধর্ম নিয়ে কোনো ভালো বই না থাকাতে আমাকে উদ্যোগটি নিতে হলো। বইটিতে বাংলা ও ইংরেজিতে আমার লেখা কিছু প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। বাংলা প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত জৈনধর্ম বিষয়ক পত্রিকা ‘শ্রমণ’ থেকে। এই লেখাগুলো ছোট। কিন্তু যারা জৈনধর্ম সম্পর্কে সবেমাত্র পড়াশোনা শুরু করেছেন, তাঁদের জন্য লেখাগুলো বেশ কাজে দেবে।

বেশ অনেক জায়গা থেকে তথ্যসংগ্রহ করে সেগুলো থেকে সার আকারে এখানে বাংলা লেখাগুলো প্রকাশ করা হয়েছে। এসব ব্যাপারে যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ যার প্রাপ্য, তিনি রসায়ন শাস্ত্রের শিক্ষক রজত সুরানা জৈন। এরপরই যিনি সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত শ্রমণ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক সুখময় মাজি। ফলে তাঁর প্রতিও জানাচ্ছি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

ইংরেজি প্রবন্ধগুলো ছাপা হয়েছে কলকাতার ‘জৈন ভবন’ থেকে প্রকাশিত ‘জৈন জার্নাল’ (Jain Journal) থেকে। এর মধ্যে একটি লেখা গত বছরের অর্থাৎ ২০২৪ এর এপ্রিলে রাজস্থানের জোধপুরের বিখ্যাত ‘সম্বোধি ধামে’ ইন্ডিকা (INDICA) আয়োজিত আন্তর্জাতিক জৈন সেমিনারে আমার পঠিত প্রবন্ধের লিখিত রূপ। এটিও জৈন জার্নাল প্রকাশ করেছে। একটি প্রবন্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি’ বিভাগ থেকে প্রকাশিতব্য। একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা প্রেসেনজাতে (Pressenza - International Press Agency)। লেখাটি ইংরেজি ও স্প্যানিশ উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে শুধু ইংরেজি ভার্সনটি রাখা হয়েছে। যারা জৈনধর্ম বিষয়ে প্রাথমিক পড়াশোনা ছাড়িয়ে আরো কতকটা এগিয়েছেন এই লেখাগুলো তাঁদেরও কাজে দেবে।

এখানে প্রথমে বাংলা প্রবন্ধগুলো ও পরে ইংরেজি প্রবন্ধগুলো পরিবেশন করা হলো।

ইংরেজি প্রবন্ধগুলো প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন জৈন ভবন পবিলিকেশন থেকে নিয়মিত প্রকাশিত জৈন জার্নালের সম্পাদক ড. অনুপম যশ। সব জায়গাতেই আমি ‘মহাবীর ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের’ প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি হিসেবেই লিখেছি ও বক্তব্য দিয়েছি।

বাংলা লেখাগুলোতে জৈনধর্মকে ক্রিটিক্যাল দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। ইংরেজি লেখাগুলো সেই তুলনায় কিছুটা ক্রিটিক্যাল। তারপরেও জৈনধর্ম নিয়ে প্রথম বই বিধায় লেখাগুলোতে খুব তির্যকভাবে জৈনধর্মকে দেখা হয়নি। জৈনধর্মকে এর অনুসারীদের দৃষ্টিতে দেখারও একটি আগ্রহ আমার ছিল।

লেখাগুলো এক মলাটে বই আকারে প্রকাশ করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করেছেন ঐতিহ্যের স্বত্বাধিকারী আরিফুর রহমান নাইম ভাই। তাঁকে ও ঐতিহ্য পরিবারের সবাইকে আমার প্রাণঢালা ভালোবাসা।

লেখাগুলো জৈনধর্ম ও সভ্যতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী গবেষক ও পাঠকদের কিঞ্চিৎ কাজে দিলেও আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করব।

আপনাদের সবার প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

মুহাম্মদ তানিম নওশাদ
১৯শে জানুয়ারি, ২০২৫
শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর

সূচিপত্র

জৈনধর্ম ও তীর্থঙ্কর মতাদর্শ ১১
জৈনমতে অরিহন্ত কে? ১৫
জৈন নৈতিকতা ১৮
তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্ম, নির্বাণ এবং তারপর ২১
আদিনাথ তীর্থঙ্কর ঋষভ দেব এবং অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের তাৎপর্য ২৪

জৈনধর্ম ও তীর্থঙ্কর মতাদর্শ

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে ভারতবর্ষে মহামানব তীর্থঙ্কর মহাবীরের আগমন ঘটে এবং তিনি এক অভূতপূর্ব দর্শন নিয়ে জ্ঞানজগতে উদিত হন। তিনি পদ্ধতির দিক থেকে নিপুণ এবং সুনির্ধারিত এক তত্ত্ব জগতে প্রচার করেন। এই তত্ত্ব আধ্যাত্মিক এবং জৈনমতে তা শাশ্বতও বটে। এর রয়েছে এক সুনির্দিষ্ট বিশ্বতত্ত্ব। দার্শনিক দিক দিয়েও এই মহান ধর্ম ঋদ্ধ। এই ধর্মের মূল স্তম্ভ তিনটি। অহিংসা তার একটি। এ হচ্ছে সেই ধর্ম, যা অহিংসা ও অহমকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে মানুষকে তার জীবজ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে সক্ষম করে তোলে। এই ধর্মের আরো দুটি মূল স্তম্ভ রয়েছে; যথা: অনেকান্তবাদ ও অপরিগ্রহ। এই অপর দুটি স্তম্ভও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেকান্তবাদ মূলত 'দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্য চূড়ান্তভাবে একটি'— এই চরমপন্থাকে বাতিল করে। এই মতে পরম সত্য জটিল এবং বহুরূপে তা জগতে প্রকাশিত। আর তা বিশদভাবে বোঝার জ্ঞানও সাধনার দ্বারা অর্জন করতে হয়। এই পরম সত্য বা 'কেবল জ্ঞান' শুধু তিনিই অর্জন করতে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, যিনি অরিহন্ত। জৈনমতে, এই কেবল জ্ঞান হচ্ছে মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ জ্ঞান। কেবল জ্ঞান অর্জনকারী ব্যক্তিকে কেবলী বলা হয়। কেবলী বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। তিনি ঊর্ধ্বলোক, মধ্যলোক ও অধঃলোককে সর্বকাল ও তাদের পর্যায়সহ সম্পূর্ণরূপে অবগত এবং এই ত্রিলোককে তাদের অন্তর্গত ও মধ্যস্থিত সমস্ত কিছুসহ সম্যকরূপে জানেন। আর অরিহন্ত হচ্ছেন সেই জন, যিনি নিজের ভেতরের তাড়না যথা: ক্রোধ, আত্মম্ভরিতা এবং লালসাকে জয় করতে পেরেছেন। এই ব্যক্তিই বিজয়ী বা জিনা। আর তার অনুসারীগণই জৈন। অনেকান্তবাদ চিন্তার বহুত্বকে অনুমোদন দিয়ে জগৎকে বিকশিত ও নিরাপদ করে।

অপরিগ্রহ হচ্ছে সন্ন্যাস চর্চা, যা আত্মিক ও সামাজিক বন্ধন এবং বস্তুগত আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে মানুষকে চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক মার্গে ধাবিত করে।

জীবনের শেষলগ্নে অরিহন্তগণ কর্মকে ধ্বংস করতে পারেন এবং মোক্ষ অর্জন করে সিদ্ধাতে পরিণত হন।

জৈনমতে সাত রকমের কেবলীর কথা বলা হয়েছে, যথা:

১. তীর্থঙ্কর কেবলী: তীর্থঙ্কর হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বজ্ঞান অর্জন করে সর্বজ্ঞানী হন, আর তার পঞ্চকল্যাণক হয় এবং তার মধ্যে তীর্থঙ্কর প্রকৃতির উদয় হয়। তার মধ্যে সমসরণ বা সমোপসরণ ঘটে, যেখানে ধর্ম মহাসভার উন্মেষ ঘটে এবং তীর্থঙ্করের দেহ থেকে দিব্যধ্বনির উদয় ঘটে। আর সমসরণ বা সমোপসরণ সভা হচ্ছে মহাবিশ্বের সব জীবসমূহের সভা, যেখানে তারা স্ব-স্ব ভাষায় তীর্থঙ্করের প্রদত্ত বাণী বুঝতে সক্ষম হয়। তীর্থ শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে 'সংসার সমুদ্র' বা 'ভব সমুদ্র'। তীর্থঙ্কর কেবলী সমগ্র জীবজগৎকে সেই সমুদ্র পার করতে সাহায্য করেন।

২. সাধারণ কেবলী: তিনি আমাদের মতো সাধারণ মানুষ। সংযম ও তপস্যা দ্বারা চার রকম ঘাতী কর্ম বিনষ্ট করে কেবলী হন, তিনি সাধারণ কেবলী বা সামান্য কেবলী। এই চার ঘাতীকর্ম হচ্ছে ১) জ্ঞানবর্ণ কর্ম— যা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে, ২) দর্শনবর্ণ কর্ম— যা ইন্দ্রানুভূতিকে আচ্ছন্ন করে, ৩) অন্তরায় কর্ম— যা জ্ঞান ও বোধকে বাধাগ্রস্ত করে, ৪) মোহনীয় কর্ম— যা প্রজ্ঞা, চেতনা ও অনুভূতিকে বিভ্রান্ত করে।

৩. অন্তঃকৃত কেবলী: যে জীব সংযম ধারণ করে অন্তর্মুহূর্তের মধ্যে কেবল জ্ঞান অর্জন করেন তাঁকে অন্তঃকৃত কেবলী বলে। অন্তর্মুহূর্ত খুবই সামান্য সময়। এই কালপর্বের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবের পুত্র মহারাজ ভরতচক্রবর্তী ছিলেন অন্তঃকৃত কেবলী। তাঁর নামেই ভারতবর্ষের নামকরণ করা হয়েছে।

৪. উপসর্গ কেবলী: যিনি সংযম ধারণ করেছেন, মোক্ষ-মার্গের পথে অগ্রসর হচ্ছেন, কিন্তু তাকে নানা উপসর্গ সহ্য করতে হয়েছে, তবে সেসব তাঁকে টলাতে পারেনি এবং পরিশেষে তিনি কেবল জ্ঞান অর্জন করেছেন, তিনি উপসর্গ কেবলী। কেবল জ্ঞান অর্জন করার পর আর কোনো উপসর্গের উদয় হবে না। কুলপুষণ মুনী ও দেশভূষণ মুনী এরকম দুই কেবলী।

৫. মূক কেবলী: সাধারণত কেবল জ্ঞান অর্জন করার পর সাধারণত কেবলীগণ লোককল্যাণের জন্য বা জগতের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টিজগৎকে হিতোপদেশ দেন। কিন্তু মূক কেবলীগণ নীরব থাকেন, তাঁরা

উপদেশ দেন না। মহারাজ ভরতচক্রবর্তীর ৯২৩ জন পুত্র ছিল, যারা এই কালপর্বের প্রথম বা আদি তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবের পৌত্র ছিলেন। এঁরা সবাই ছিলেন মূক কেবলী।

৬. সমুৎঘাত কেবলী: কেবল জ্ঞান অর্জন করতে হলে চার রকমের ঘাতীকর্ম বিনষ্ট করতে হয়, চার রকমের অঘাতীকর্ম তখনো থেকে যেতে পারে। এর একটি হচ্ছে আয়ুকর্ম। যে কেবলীর আয়ুকর্ম শেষ বা বিনষ্ট হতে সামান্য মাত্র সময় বাকি রয়ে গিয়েছে, কিন্তু বাকি তিনটি অঘাতী কর্ম অর্থাৎ নামকর্ম, গোত্রকর্ম ও বেদনাকর্ম তখনো রয়ে গিয়েছে, বিনষ্ট হয়নি, আর সেগুলো বিনষ্ট করার জন্য আত্মার প্রদেশ তখন তাঁর বাড়তে থাকে, ফলে তখন তিনি কেবল জ্ঞান অর্জন করেন। ইনি সমুৎঘাত কেবলী।

৭. অনুবদ্ধ কেবলী: যদি কোনো কেবলী চার রকমের ঘাতীকর্ম বিনষ্ট করে কেবল জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং তারপর চার রকমের অঘাতীকর্মও বিনষ্ট করে মোক্ষলাভ করেন, আর তার পরপরই অপর কারো বিরতি ছাড়াই কেবল জ্ঞান অর্জিত হয়, তবে পরের জন অনুবদ্ধ কেবলী। যেমন, তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর মোক্ষলাভের সাথে সাথে গণধর গৌতম স্বামীর কেবল জ্ঞান অর্জিত হয়েছিল বলে, গৌতম স্বামী অনুবদ্ধ কেবলীর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন।

শেষ সর্বজন মান্য কেবলী হিসাবে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন মহাবীর স্বামীর এগারো প্রধানতম শিষ্যের অন্যতম জম্বুস্বামী। কেবল জ্ঞানের সার্থক চিত্রায়ণ ঘটে অরিহন্ত ও জগতের মুক্তির দিশারি তীর্থঙ্করগণের মধ্যে।

জৈনধর্মে প্রতি কালচক্রে ২৪ জন তীর্থঙ্করের আগমন ঘটে। তারা প্রত্যেকেই প্রকৃত ধর্মের সংস্থাপক এবং মানুষের মুক্তির পথপ্রদর্শক। জৈনধর্মে কালচক্র দুইভাগে বিভক্ত; যথা: উৎসর্পিণী বা কালের আরোহণ ভাগ ও অবসর্পিণী বা কালের অবরোহণ ভাগ। জৈনমতে মানুষের আয়ু, বল, সুখ, শরীরের পরিমাণ ইত্যাদির ঊর্ধ্বারোহণ কালকে বলে উৎসর্পিণী, আর এসবের ক্রমহ্রাসমান কালকে বলে অবসর্পিণী। প্রত্যেক অবসর্পিণী ও উৎসর্পিণীর তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের আবির্ভাব ঘটে এবং এই সংখ্যা নির্দিষ্ট। এরকমই বর্তমান কালচক্রের চব্বিশজন তীর্থঙ্করের প্রথমজন ঋষভ দেব এবং শেষজন অজিন নির্গ্রন্থ নাথপুত্র, যিনি নিজেকে জয় করার কারণে মহাবীর নামে খ্যাত।

বর্তমান কালচক্রের ২৪ জন তীর্থঙ্করের ক্রম নিম্নরূপ:

১. ঋষভদেব, ২. অজিতনাথ, ৩. সম্ভবনাথ, ৪. অভিনন্দন নাথ, ৫. সুমতিনাথ, ৬. পদ্মপ্রভ, ৭. সুপার্শ্বনাথ, ৮. চন্দ্রপ্রভ, ৯. পুষ্পদন্ত/সুবিধিনাথ,

১০. শীতলনাথ, ১১. শ্রেয়াংসনাথ, ১২. বসুপূজ্য, ১৩. বিমলনাথ, ১৪. অনন্তনাথ, ১৫. ধর্মনাথ, ১৬. শান্তিনাথ, ১৭. কুন্থুনাথ, ১৮. অরনাথ, ১৯. মল্লীনাথ, ২০. মুনিসুব্রত, ২১. নমিনাথ, ২২. নেমিনাথ, ২৩. পার্শ্বনাথ, ২৪. মহাবীর,

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে বৈশালীতে এক ক্ষত্রীয় রাজপরিবারে মহাবীরের জন্ম। তার পিতা মহারাজ সিদ্ধার্থ এবং মাতা রানি ত্রিশলা। শৈশব থেকেই তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী, সুবিবেচক, বীর, অকুতোভয় এবং গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। সেকালে ভারতবর্ষে অর্থাৎ জম্বুদ্বীপে ধর্মের নামে পাপাচার ও পঙ্কিলতা বাড়ছিল, সমাজ ছিল বর্ণাশ্রম প্রথার কারণে শ্রেণিবিভক্ত । ব্রাহ্মণ্যবাদের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল নিম্নবর্ণের মানুষ। তারা অপেক্ষমাণ ছিল এক শাশ্বত সত্যের এবং এক আলোকিত পুরুষের। মহাবীর ছিলেন ভারতের সেই কাঙ্ক্ষিত পুরুষ এবং মুক্তির দিশারি; যিনি ভারতে ধর্মের ইতিহাসে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যুক্তি ও আধ্যাত্মিকতার এক সুনিপুণ মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন।

জৈনমতে অরিহন্ত কে?

জৈনমতে অরিহন্ত এক বিশেষ ব্যক্তি। তিনি সেই জীব বা আত্মা কিংবা জীবাত্মা যিনি সাধনার বলে তাঁর অন্তর্গত চারটি বাসনাকে ধ্বংস করেছেন; যথা: পরিগ্রহ বা সংস্পর্শ, ঘৃণা, অহংকার এবং লোভ। এই চার শত্রুবৎ কর্মকে (ঘাতী কর্ম) ধ্বংস করে তিনি নিজেকে পূর্ণরূপে জেনেছেন ও উপলব্ধি করেছেন। অরিহন্তকে তাই অভিহিত করা হয় 'কেবলী' বলে, কারণ তিনি নিজেকে এবং জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমগ্র জগৎকে জেনে সর্বজ্ঞানী হয়েছেন। কেবল জ্ঞান তাই শুধুই জ্ঞান। এর সাথে কোনো কিছুর মিশেল বা সংযুক্তি ঘটেনি। জৈনমতে এই সমগ্র জগৎকে ও তার মধ্যস্থিত সবকিছুকে সম্যকরূপে জানা এবং সর্বকালে এ সবকিছুর অস্তিত্ব ও অবস্থাকে পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়াকে বলা হয় 'কেবল জ্ঞান'। তাই 'কেবল জ্ঞান' আদতে সম্যক, পরিপূর্ণ ও অনন্ত জ্ঞান। তিনি আত্মা এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কিত যাবতীয় সূক্ষ্ম ও স্থূল জ্ঞান রাখেন। এই সম্যক, পরিপূর্ণ ও অনন্ত জ্ঞান লাভের কারণে অরিহন্ত নিজেকে ও সমগ্র জগৎকে জয় করেন। তাই অরিহন্তগণ জৈন শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধুদের কাছে 'জিনা' অভিধায় বিভূষিত হন। ফলে এক অর্থে কেবলীর কোনো মৃত্যু নেই। কিন্তু পৃথিবীতে একটি দেহ ধারণের কারণে তার একটি পার্থিব জীবৎকাল আছে। সেই সময়ের মধ্যে তিনি তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে পার্থিব জীবৎকাল শেষ করার আগেই তিনি তার সমস্ত পার্থিব কর্মকে ধ্বংস করে মোক্ষ অর্জন করেন এবং পরিণত হন এক 'সিদ্ধ'তে। অরিহন্ত একজন শরীরী অস্তিত্ব, কারণ তাঁর একটি পার্থিব শরীর বা কায়া আছে। কিন্তু একজন সিদ্ধ, যিনি সিদ্ধি অর্জন করেছেন, তাঁর কোনো শারীরিক বা কায়িক অবয়ব ও অস্তিত্ব থাকে না। একজন সিদ্ধ প্রকৃতার্থে এক অশরীরী পূর্ণ আত্মা। তিনি জীবন-মৃত্যুর চক্রকে ছেদ করেছেন। জৈনধর্মের মহাপবিত্র মন্ত্র যেটি নমোকারা মন্ত্র নামে সুপরিচিত তা পঞ্চ-পরমস্তির প্রতি নিবেদিত। এই পাঁচ পরম অস্তিত্ব হচ্ছেন,

১. অরিহন্ত— যিনি কেবলজ্ঞান অর্জন করে জিতেন্দ্রিয়, জিনেন্দ্র ও বিশ্বজয়ী হয়েছেন ।

২. সিদ্ধ বা অশরীরী– যিনি মোক্ষ অর্জন করেছেন এবং জীবন-মৃত্যুর চক্রকে ছেদ করেছেন ।

৩. আচার্য— ইনি জৈন সাধু, সন্ন্যাসী বা শ্রমণ সংঘের প্রধান । কয়েকজন প্রখ্যাত আচার্যের নাম আমরা এক্ষেত্রে স্মরণও করতে পারি; যেমন: ভদ্রবাহু (খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর একজন দিগম্বর সাধু ও জৈন আগম শাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান অর্জনকারী শেষ শ্রুতকেবলী), কুন্দাকুন্দ (খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন দিগম্বর সন্ন্যাসী ও দার্শনিক), সামন্তবাহু (খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকের একজন প্রখ্যাত দিগম্বর আচার্য ও সন্ন্যাসী) , উমাস্বামী বা উমাস্বতী (খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়কার জৈন দার্শনিক ও তাত্ত্বিক, মৌলিক গ্রন্থের লেখক; বিশেষত জৈন গ্রন্থ তত্ত্বার্থসূত্রের লেখক হিসেবে সুবিদিত) এবং স্থূলভদ্র (তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর একজন প্রভাবশালী জৈন শাস্ত্রজ্ঞ) ।

৪. উপাধ্যায়— ইনি জৈনশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় শিক্ষক ।

৫. মুনি— ইনি সর্বত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণকারী ও জৈন সংঘে বা আশ্রমে যোগদানকারী জৈন সাধু বা সন্ন্যাসী । জৈন সাধুগণ অবশ্য প্রধানত দুভাগে বিভক্ত; যথা: দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর । দিগম্বর সাধু তাঁরাই যাঁরা আকাশ বা দিগন্তকে তাদের ভূষণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন । তাই তাঁরা পার্থিব বস্ত্র ত্যাগ করে নগ্ন সাধু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন । আর শ্বেতাম্বর সাধুগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে সন্ন্যাস জীবন পরিগ্রহ করেছেন ।

ফলে দেখা যাচ্ছে যে, অরিহন্ত এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় সর্বোচ্চে আরোহিত ব্যক্তি । তিনি অসীম জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে পরম সুখ এবং পরম পবিত্র দেহ বা 'পরমউদারিক শরীর' লাভ করেছেন ।

একজন অরিহন্ত সর্বত্যাগী ব্যক্তি ও সর্বজয়ী । তিনি তপস্যা করেন, সাধনা করেন । আর বিশ্বসংসারকে তিনি পথ দেখান । জীব ও আত্মার মুক্তি তাঁর কাম্য । কিন্তু সব অরিহন্ত জৈনধর্ম বা জৈনপথকে নতুন ধারায় সূচিত করতে পারেন না, এতে নতুন জোয়ার বা প্লাবন নিশ্চিত করতে পারেন না । এই বিশেষ ও অভাবনীয় কাজটি করেন জৈন তীর্থঙ্করগণ । ফলে সকল জৈন তীর্থঙ্করগণই কেবলী ও অরিহন্ত, কিন্তু সকল কেবলী বা অরিহন্তই তীর্থঙ্কর নন । তীর্থঙ্কর শুধু ধর্মে নবপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন না, তিনি জৈনধর্মকে রক্ষাও করেন । প্রতি কালচক্রে এই তীর্থঙ্করের সংখ্যা নির্দিষ্ট, আর তা চব্বিশ ।

জৈনধর্মে কালচক্র দুইভাগে বিভক্ত; যথা: উৎসর্পিণী বা কালের আরোহণ ভাগ ও অবসর্পিণী বা অবরোহণ ভাগ। শাস্ত্রীয় জৈনমতে মানুষের আয়ু, বল, সুখ, শরীরের পরিমাণ ইত্যাদির ঊর্ধ্বারোহণ কালকে বলে উৎসর্পিণী, আর এসবের ক্রমহ্রাসমান কালকে বলে অবসর্পিণী। সুনির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক অবসর্পিণী ও উৎসর্পিণীর তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের আবির্ভাব ঘটে। এরকমই বর্তমান কালচক্রের চব্বিশজন তীর্থঙ্করের প্রথমজন ঋষভ দেব এবং শেষজন অজিন জ্ঞাতপুত্র নাথপুত্র, যিনি নিজেকে জয় করার কারণে মহাবীর নামে খ্যাত। খ্রিষ্টের জন্মেরও ৬০০ বছর আগে তিনি ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা সিদ্ধার্থ ও তার রানি ত্রিশলার পুত্র হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেন। রাজপুত্র বর্ধমান নামে তিনি খ্যাত ছিলেন। রাজার পুত্র হিসেবেও তিনি ন্যায়, উদারতা, ধর্ম ও করুণার আধার ছিলেন। পুরাতন জৈন সাহিত্যে তাকে ন্যায়পুত্র বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তৎকালে জম্বুদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনাচার দূর করতে, আজীবক সম্প্রদায়ের নানান ধারার বিভ্রান্তি অপনোদন করতে এবং শ্রমণ আন্দোলনকে পূর্ণতা দিতে তিনি ধরিত্রীর বুকে আবির্ভূত হন। নাথপুত্র মহাবীরের কাল এখনো শেষ হয়নি। কারণ বর্তমান চব্বিশ তীর্থঙ্করের এই কালচক্র এখনো বহমান ও কার্যকর। তিনি এই চব্বিশজনের শেষ জন। ফলে তার দিব্যজ্যোতিতে আজও প্লাবিত হচ্ছে জম্বুদ্বীপসহ সমগ্র বিশ্বচরাচর। তাঁর ধর্ম, জ্ঞান ও নির্দেশনা আজও জগতের ও মানবমুক্তির জন্য প্রাসঙ্গিক— এ জৈনধর্মের এক স্থির বিশ্বাস।

জৈন নৈতিকতা

জৈন ন্যায়শাস্ত্রের ধারণাটি গড়ে উঠেছে আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ওপর ভিত্তি করে। এর সাথে বিজড়িত আছে জৈনবিশ্ববীক্ষণ। ব্যক্তি সে যেকোনো সত্তাই হন, নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে করতে বহু জীবনের সাধনা শেষে একদা হয়ে উঠতে পারেন অরিহন্ত, এমনকি তীর্থঙ্কর। এই পথেই একজন মুক্তিকামী নিজেকে সংযত করে এবং সর্বতোভাবে নিজেকে জয় করে হন জিনা।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণের অন্যতম মূলমন্ত্র হচ্ছে বিনয়। বিনয় আত্মমুক্তির পথে অনেক অর্গলকে উন্মুক্ত করে। বিনয়ী সত্তা সুস্থিরভাবে জগৎকে অবলোকন করতে পারেন, নিজেকে ও অন্যকে পরিমাপ করতে পারেন। এতে তিনি ক্রোধকে দমন করতে পারেন, দ্বেষ ও ঈর্ষা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন। বিনয়াবনত ব্যক্তি মাত্রই হন অহংকারমুক্ত এক সত্তা, আত্ম উত্তরণের জন্য যা অতীব দরকারি। আর বিনয়ী ব্যক্তি কখনো আত্মকেন্দ্রিক হন না, যখন এই বিনয়ের মূল লক্ষ্য কেবল জ্ঞান অর্জন করে সর্বজ্ঞানী বা কেবলী হওয়া।

অন্যদিকে শ্রমণ ঐতিহ্যের একটি বড় লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে হতাশা থেকে মুক্তি দান। আর প্রক্রিয়াটি কার্যকর আছে এই ঐতিহ্যের কিছু উন্নত দর্শনে বিধিবদ্ধ কিছু প্রক্রিয়াকে লালন করার মধ্য দিয়ে; জৈন দর্শন তার অন্যতম। এখানে বলা হচ্ছে, বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা জীবসত্তায় নয়, মুক্তি ও পরিত্রাণের বীজ উপ্ত আছে প্রতিটি সত্তার মধ্যে। প্রতিটি সত্তাই নিজেকে সংযত রেখে, ক্রোধ, অহংকার ও ঈর্ষা মুক্ত হয়ে নিজেকে বিনয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এতে অপরিগ্রহের অপার মহিমা তাকে নিরপেক্ষভাবে জগৎকে দেখতে ও বুঝতে দেয়। অপরিগ্রহ শেখায় বাসনাসক্ত না হয়ে জগতে থেকেও জগৎ থেকে মুক্ত থাকার উপায়। এ এক অনবদ্য আত্মিক ও আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণ। এক ক্ষুদ্র মাইক্রোকজম থেকে বিশাল ম্যাক্রোজমকে উপলব্ধির এক দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ। ফলে মানবিক হওয়া থেকে শুরু করে

আরো ঊর্ধ্বস্তরে উঠে সকল সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়ার বা অনুগ্রহ করার বোধটিও এতে আত্মস্থ হয়। পরিশেষে নৈতিকতার চূড়ান্ত রূপটি প্রস্ফুটিত হয় একজন ব্যক্তির মধ্যে যখন তিনি শুধু নিজের মুক্তি কামনা করেন না, জগতের সব সত্তাকে মুক্তি দানে তিনি সদিচ্ছা পোষণ করেন।

পুরো প্রক্রিয়াটি যে সর্বোচ্চ নৈতিকতাকে সামগ্রিকভাবে প্রকাশ করে তা অহিংসা। তার কারণও সুস্পষ্ট। অসীম জগৎ ও সামগ্রিক সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত হলে ব্যক্তির মধ্যে যে কাণ্ডজ্ঞান উপ্ত হয়, তাতে তিনি আর কারো প্রতি দ্বেষ পোষণ করতে পারেন না। সামগ্রিক বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করে অরিহন্ত হয়ে ওঠার আগেই তাঁর এই জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হতে পারে। আর এতে করে তিনি বুঝতে পারেন শুধু নির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শে সীমাবদ্ধ থাকার সংকীর্ণতা। অসীম বাস্তবতা না বোঝার ও হৃদয়ঙ্গম না করার কারণে মানুষ বা কোনো সত্তা খণ্ডিত বাস্তবতা ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জগৎকে বিচার করেন, গড়ে তোলেন তাঁর মতো করে কোনো দর্শন। ফলে পৃথিবীতে অসংখ্য দর্শন ও বিশ্ববীক্ষণ গড়ে উঠেছে। এ নিয়ে জগতে হানাহানিরও শেষ নেই।

অনেকান্তবাদের শিক্ষা সবাইকে একটি অমোঘ বার্তা দেয়। এই জগৎকে সর্বতোভাবে জানেন শুধু কেবলজ্ঞানপ্রাপ্ত অরিহন্ত ও তীর্থঙ্করগণ। উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। একটি ঘনককে নানা দিক দিয়ে দেখা যায়। আর এক্ষেত্রে সব পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণই সঠিক। যদিও ঘনকটিকে আংশিকভাবে দেখা যায়, তাও সত্যি। কিন্তু তাতে ঘনককে একজন পর্যবেক্ষকের চোখ দিয়ে পরিপূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করা যদি নাও হয়, পর্যবেক্ষক যা দেখছেন তাও ফেলে দেবার মতো নয়। তিনি সমগ্রকে দেখছেন না, সেটিও বাস্তবতা। পৃথিবীর সকল কাজকর্ম অনেকের এই আংশিক পর্যবেক্ষণেই চলছে। জৈনধর্ম এই বাস্তবতা স্বীকার করে। ফলে বাস্তবকে বোঝার এই অনেক তল বা অন্ত নিয়ে গড়ে উঠেছে অনেকান্তবাদ। যদিও বলা হয় দ্বিতীয় শতাব্দীর দিগম্বর আচার্য সামন্তভদ্র এই মতবাদের জনক, কিন্তু সত্যি বলতে গেলে বলতে হয় জৈন সব মতাদর্শ ও ধারণাই জৈন অরিহন্ত ও তীর্থঙ্করদের বচন, কর্ম ও সামগ্রিক শিক্ষা থেকে আহরিত বা উপলব্ধ।